# ভূমিকা

প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি সাহিত্যশাখা হল মঙ্গলকাব্য। দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই মঙ্গলকাব্যের একটি ধারা হল মনসামঙ্গল। জলা-জঙ্গলময়, নদীকেন্দ্রিক মনোরম প্রকৃতির এই বাংলায় সর্পের আধিক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে কল্পিত সর্পদেবীকে কেন্দ্র করে যে গালগল্প, তা লিখিত আকারে রূপ নেয়। আর এই লিখিত রূপ মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। এই সূত্রে বলা যায়— উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিকতার প্রভাব বঙ্গভূমিতেও এসে পড়ে। নবজাগরণের ফলে দেবতার থেকে মানবতাবাদই বড় হয়ে ওঠে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভাবনার পরিবর্তন। বিশ্বায়ন ও যান্ত্রিক সভ্যতার আগমনের ফলে তৈরী হয় সুবিধাবাদী সমাজ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ও মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমূল পরিবর্তন আসে। আধুনিক সাহিত্যসংরূপ তথা গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মাধ্যমে কবি-সাহিত্যিকগণ আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য কোন কোন কবি-সাহিত্যিক হাত বাড়িয়েছেন বাঙালি ঐতিহ্যের দিকে। এই সূত্রে বলে নেওয়া দরকার যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গতানুগতিকতা ও পুচ্ছানুগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট হলেও আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কাব্য-কবিতা প্রভৃতি নতুন নতুন সাহিত্য-সংরূপের সৃষ্টি তার সলতে পাকানো হয়েছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। বলাবাহুল্য, আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের শিকড় হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য। আধুনিক যুগে কবি সাহিত্যিকগণ মিথ তথা পুরাণ কাহিনীকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড় করিয়েছেন। চর্যাপদকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' (১৯২৩), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' (১৯৫৯), সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২), সাইমন জাকারিয়ার 'প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক' (২০০৭), 'ন নৈরামণি' (২০১০), ও 'বোধিদ্রুম' (২০১০), শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'অসম্ভব গোল টেবিল' (২০০২), 'কাহ্ন' (২০১০) প্রভৃতি রচনাগুলি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৭৬), দীপক চন্দ্রের 'মন বৃন্দাবন' (১৯৯৩) ও 'যদি রাধা না হত' (১৯৯৫) উপন্যাস রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাবস্যার গান' (১৯৭১), সেলিনা

হোসেনের 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪), 'কালকেতু ফুল্লরা' (২০০৭), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩), সত্যপ্রিয় ঘোষের 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' (১৯৯৯), শচীন দাশের 'নদীতরঙ্গের আয়না' (২০০৯), মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৬৪), 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'বেনে বউ' (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাস লেখা হয়েছে। এছাড়া শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮), শিশিরকুমার দাসের 'ভাড়ুদত্ত' (১৯৭৭), শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' (২০০২) এবং মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও কবিতার সংখ্যাও অনেক। মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথ দেখিয়েছেন। মধ্যযুগীয় মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন দেবী মনসা। কখনো প্রতিষ্ঠানিক আগ্রাসী শক্তি রূপে, কখনো কল্যাণময়ী রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী হতাশাগ্রস্ত, অসহায়, স্বপ্নভঙ্গের শিকার নিঃস্ব মানুষের শক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠে মনসাকথার বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী চাঁদ সদাগর। আবার উত্তর-আধুনিক যুগের অস্তিত্বের সংকটের জর্জরিত ও যৌন বুভুক্ষ যুবা পুরুষে পরিণত হয়েছে লখীন্দর। বেহুলা হয়ে উঠেছে বিশ ও একুশ শতকের প্রতিবাদী নারী রূপে। কোন অন্যায়, অশুভ শক্তিকে মেনে নিতে রাজি নয়। বঙ্গদেশের এই নারী স্বামী-পুত্র-আত্মিয়-স্বজন সবাইকে প্রয়োজনীয় ভাবে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করতে করতে আত্মত্যাগে বা আত্মবিসর্জনে ক্রমশ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক জীবনদীপ্ত সংগ্রামী মনোভাব উঠে এসেছে। মধ্যযুগীয় এই চরিত্রগুলি কালের গণ্ডী পেরিয়ে সব যুগের সব কালের চরিত্র হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের কালচৈতন্য থেকে আজকের আধুনিক স্বদেশের মরা গাঙে অস্ত্র হয়ে উঠেছে চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি। আবার মনসামঙ্গল কাব্যকে গ্রহণ করে আধুনিক কালে গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করেছেন ঠিকই, তবে সময়ের ব্যবধানের নিরিখে, স্থানভেদে, ব্যক্তিভেদে প্রত্যেক রচনাতে বিভিন্ন ভাবনা কাজ করেছে। আবার প্রকরণের দিক দিয়েও একটি রচনা অন্যটির থেকে আলাদা মাত্রা লাভ করে। বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে সাহিত্য সংরূপের এই অভিনব ধারার দিকটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এযাবৎ এ বিষয় নিয়ে সম্মানীয় প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর' গ্রন্থে, বিশিষ্ট সমালোচক ও অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর মহাশয় 'অনুসৃজনে মনসাপুরাণ' প্রবন্ধে এবং সমালোচক জহর সেনমজুমদার তাঁর 'মধ্যযুগের বেহুলা : নির্মাণ ও বিনির্মাণ' প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে আলোচনায় নিজেদের যুক্ত করেছেন। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসা-কথার যে নবনির্মাণ সে বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা তেমনভাবে এখনো পাওয়া যায় না। এই বিষয়টিতে আগ্রহবশতই আধুনিক

সাহিত্য-সংরূপে মনসাকথার যে নবনির্মাণ তা অন্বেষণই আমার গবেষণার মূল বিষয়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির আখ্যানভাগ ও চরিত্রসমূহের যে বিবর্তিত আধুনিক রূপ উনিশ শতকের প্রথম দশকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা' (১৯০৭) গদ্য-আখ্যানটি থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পাই, এই নবনির্মাণের দিকটি পরিস্ফুট করার জন্য আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি বর্তমান অভিসন্দর্ভে। আধুনিক 'বাংলা সাহিত্যে মনসাকথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে' শিরোনামের গবেষণার বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রথম অধ্যায়ের বিষয় হিসেবে মনসা কথার মিথকে নিয়েছি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসাদেবীর যে পরিচয় এবং তৎসঙ্গে যে চাঁদ সদাগর, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর স্বল্প পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই, পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব এবং উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যকে আলোচনার অন্তর্গত করেছি। পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়গুলিতে আধুনিক গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে মনসাকথার নবনির্মাণ তার প্রবেশক রূপে রেখেছি তৃতীয় অধ্যায়টিকে। আধুনিক সাহিত্য সংরূপে আমাদের আরাধ্য দেবী মনসার মিথের নবনির্মাণ কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরাই আমার গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। আমার গবেষণা, অনুসন্ধান ও অন্বেষণের মধ্য দিয়ে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসাকথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে' তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পরবর্তী অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে।

*****